প্রকল্পের নামঃ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চত্বরে “বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল” স্থাপন।
বাস্তবায়নকারীঃ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার। মুজিব ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। তিনি স্থানীয় গীমাডাঙ্গা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। চোখের সমস্যার কারণে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর ব্যাহত হয়। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এ এবং একই কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি.এ পাশ করেন।

রাজনৈতিক জীবনঃ স্কুল জীবন থেকেই মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের ছাত্র সে সময় একবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হক ঐ স্কুল পরিদর্শনে আসেন (১৯৩৯)। শোনা যায়, ঐ অঞ্চলের অনুন্নত অবস্থার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তরুণ মুজিব বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। ম্যাট্রিক পাশের পর মুজিব কলকাতায় গিয়ে ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি আই.এ ও বি.এ পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৪৩ সাল থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এইচ. এস সোহরাওয়ার্দীর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেলায় দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্ব অপর্ণ করে।

ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। তবে পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। কারণ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে তাঁকে ১৯৪৯ সালের প্রথমদিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে প্রধান সংগঠকদের একজন ছিলেন শেখ মুজিব। বস্তুত জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের (১৯৪৯) যুগ্ম সম্পাদকের তিনটি পদের মধ্যে একটিতে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। অপর দুই যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং এ.কে রফিকুল হোসেন। ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৬ সালেই তিনি দলের সভাপতি হন। দলকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দেওয়ার জন্য ১৯৫৫ সালে মুজিবের উদ্যোগে দলের নাম হতে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের পর রাজনীতিতে তাঁর যে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটেছিল এ ছিল তারই প্রতিফলন।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় (১৯৫৬-৫৮) মাত্র নয় মাস কাজের পর মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। ১৯৬৪ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার মতো সাহসিকতা দেখিয়েছেন শেখ মুজিব, যদিও তাঁর রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ রেখে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক মোর্চার

ব্যানারে কাজ করার সপক্ষে ছিলেন। পাকিস্তান ধারণাটির ব্যাপারে ইতোমধ্যেই মুজিবের মোহমুক্তি ঘটেছিল। পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ ও আইনসভার সদস্য (১৯৫৫-১৯৫৬) এবং পরবর্তীতে জাতীয় পরিষদের সদস্য (১৯৫৬-১৯৫৮) হিসেবে তাঁর এমন ধারণা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মনোভাবের মধ্যে সমতা ও সৌভ্রাতৃত্ব বোধ ছিল না।

শেখ মুজিব ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দীদের একজন (১১ মার্চ ১৯৪৮)। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার অধিকার দাবি করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

'আমরা এখানে বাংলায় কথা বলতে চাই। আমরা অন্য কোনো ভাষা জানি কি জানি না তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি মনে হয় আমরা বাংলাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারা সত্ত্বেও আমরা সবসময় বাংলাতেই কথা বলব। যদি বাংলায় কথা বলতে দেওয়া না হয় তাহলে আমরা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাবো। কিন্তু পরিষদে বাংলায় কথা বলতে দিতে হবে। এটাই আমাদের দাবি।'

এছাড়া ১৯৬৬ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং এই ছয় দফাকে আখ্যায়িত করেন 'আমাদের (বাঙালিদের) মুক্তি সনদ' রূপে। দফাগুলো হলো : ১. ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন এবং সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন; ২. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত অপর সকল বিষয় ফেডারেটিং ইউনিট বা প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৩. দুই রাষ্ট্রের জন্য পৃথক মুদ্রা চালু করা অথবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৪. করারোপের সকল ক্ষমতা ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করা; ৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে স্বাধীনতা প্রদান; ৬. রাষ্ট্রসমূহকে নিজের নিরাপত্তার জন্য মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা। সংক্ষেপে এ কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রতি তাঁর এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ছয়-দফা কর্মসূচীর অর্থ ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা। সকল রাজনৈতিক দলের রক্ষণশীল সদস্যরা এ কর্মসূচীকে আতঙ্কের চোখে দেখলেও এটা তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্র, যুবক এবং শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে নূতন জাগরণের সৃষ্টি করে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের প্রথমদিকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মের দ্বারা সংগঠিত গণআন্দোলন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে আইয়ুব সরকার দেশে আসন্ন একটি গৃহযুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টায় মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি আসন সহ) জয়লাভ করে। আপামর জনগণ তাঁকে ছয়দফা মতবাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট প্রদান করে। ছয় দফা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রমনা রেসকোর্সে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং শপথ নেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তারা কখনও ছয়দফা থেকে বিচ্যুত হবেন না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষন

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের বিশাল জমায়েতে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। মুজিব তাঁর ভাষণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্যর্থ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ আনেন। বক্তৃতার শেষে মুজিব ঘোষণা করেন: 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

অবশেষে দীর্ঘ ০৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বরণ করা লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল উপজেলা চত্বরে স্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল
উপজেলা চত্বর,পঞ্চগড় সদর,পঞ্চগড়।